২

ভারত শাসন আইন ও রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ (১৯১৯-১৯৩৭)

ভূমিকা

ভারতবর্ষের জনগণকে ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার অভিপ্রায়ে এবং তাদেরকে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে শাসন করবার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন পাস করেছে। এ সমস্ত আইন ব্রিটিশ ভারতের সাংবিধানিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসের অগ্রগতিকে বহুদূরে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন সাংবিধানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ বা ফলক। কারণ এই আইনের মধ্যে দিয়েই প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার জন্ম হয়। যদিও এ ব্যবস্থা ছিল পরোক্ষ পদ্ধতির। অচিরেই এই আইনের ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে। এরপর ১৮৯২ সালে কাউন্সিল আইন পাস হয়। তবে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো নির্বাচনের নীতি প্রবর্তন করা হয়। ১৯০৯ সালের আইন অনুসারে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই সব আইন পরিষদগুলো গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা কমিটি হিসাবেই কাজ করত। এদের আইন প্রণয়নের প্রকৃত কোন ক্ষমতা ছিল না। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পাস করে ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতের সব রাজনৈতিক দলই একে অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক ও নৈরাজ্যকর বলে ঘোষণা করে। ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ঘোষণা করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। বস্তুত ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যর্থতার ফলশ্রুতি হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। বলা যায় এ আইন পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মূলভিত্তি রচনা করে। অবসান ঘটে ব্রিটিশ শাসনের। স্বাধীনতা লাভ করে ভারত ও পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র।

সুতরাং এদিক থেকে বিবোচনা করলে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। 'ভারত শাসন আইন ও রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ (১৯১৯-১৯৩৭)' শীর্ষক ইউনিটের বিষয়কে আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- পাঠ -১ : ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন
- পাঠ -২ : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি—
- ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারবেন;
- ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পটভূমি

১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদিও ভারতীয়দের অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলো তা সত্ত্বেও তাদের দাবির তুলনায় এগুলো ছিল অতি সীমিত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এ আইন মেটাতে পারে নি। একই সঙ্গে নব প্রতিষ্ঠিত দুটো প্রধান রাজনৈতিক দল নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলীম লীগ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে। তারা ব্রিটিশ সরকারের এককেন্দ্রিক, আমলাতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তে দায়িত্বশীল শাসন কায়েমের জোর দাবি জানাতে থাকে। এরমধ্যে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনগণের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে। ভারতীয়রা স্বায়ওশাসনের দাবির বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

১৯১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' করে এবং একযোগে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন পরিচালনার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে।

এ দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক গণবিক্ষোভ দ্রুত দানা বাঁধতে থাকে। যুদ্ধ-করের বোঝা, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের চাপে অতিষ্ট হয়ে দেশের দরিদ্র জনগণ মরিয়া হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনে যোগদান করতে প্রস্তুত হয়। উপরন্তু ম্যালেরিয়ার মহামারীতে তখন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হতে থাকে। ফলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ জনগণও সংগ্রামের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে।

একই সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই স্বায়ত্তশাসন তথা 'হোম রুল' এর দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করবার সিদ্ধান্ত নেয়। অ্যানি বেসান্ত এবং বি.জি. তিলকের নেতৃত্বে এ আন্দোলন খুব দ্রুত ভারতে ছাড়িয়ে পড়ে। বেসান্তোর 'নিউ ইন্ডিয়া' এবং 'কমন উইল' পত্রিকা ও তিলকের 'কেশরী' এবং 'মারাঠা' পত্রিকার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন তথা 'হোম রুলের' দাবি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার এর প্রধান নেতৃবৃন্দের উপর আক্রমণ শুরু করে। এ আক্রমণের প্রধান শিকার হন অ্যানি বেসান্ত এবং তাঁর দুজন সহকারী। তাঁদের উপর এ ধরনের সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদ হিসাবে সারা ভারতে আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে।

এ রকম অবস্থায় ভারত সচিব পদে মন্টেগু ১৯১৭ সালের ১২ জুলাই অভিষিক্ত হন। তিনি ভারতীয়দের দাবি দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাঁর দেওয়া এক ভাষণ থেকে। তিনি এই সময় বলেন "ভারতীয় জনগণকে ক্রমান্বয়ে শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সেই সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজের অংশ হিসেবে ভারতে স্বায়ত্তশাসিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা"। মন্টেগুর ভাষণের মূল কথা ছিল যে, ভারতের জনগণ তখনও স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত হয় নি এবং তাদের আস্তে আস্তে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে। তাঁর এ ঘোষণাকে কেউ কেউ "বৈপ্লবিক ঘোষণা" বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ ঘোষণার কিছু কিছু ত্রুটিও ছিল।

এতেঠ সব ঘটনা সত্ত্বেও মন্টেগু তাঁর দায়িত্বে অবিচল থাকেন এবং লন্ডন থেকে ভারতে পৌঁছে সাড়ে পাঁচ মাস কাল দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা সফর করেন। এ সফর কালে তিনি দেশীয় রাজাদের সাথে আলোচনা করেন এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফর্ড প্রথম দিকে মন্টেগুর ভূমিকার প্রতি উদাসীনতা দেখালেও পরবর্তী পর্যায়ে তার মত পাল্টান।

১৯১৮ সালের ২১ এপ্রিলে মন্টেগু এবং চেমসফর্ড এক যৌথ প্রতিবেদনে স্বাক্ষর দান করেন যার ভিত্তিতে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন রচিত হয়। মন্টেগু ও চেমসফোর্ডের নামানুসারে এ আইনের নামকরণ করা হয় 'মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন।'

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ছিল একটি বৃহৎ দলিল। এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

১। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা করা হয়। উচ্চ কক্ষের নাম রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও নিম্নকক্ষের নামকরণ করা হয় ব্যবস্থাপক সভা হিসেবে। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬০ এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জনে নির্ধারণ করা হয়।

২। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই আইনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

৩। এই আইনের অধীনে সরকারের আয়ের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এর মাধ্যমে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎসও নির্ধারিত হয়। ভূমি রাজস্ব ও মাদক দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক প্রদেশের জন্য এবং আয়কর ও বাণিজ্য কর কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত হয়।

৪। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে এক কক্ষ বিশিষ্টি আইন সভার ব্যবস্থা করা হয়। একই সঙ্গে প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়।

৫। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোতে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী বিষয়গুলোকে দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত করা হয়। সংরক্ষিত বিষয়গুলো এবং হস্তান্তরিত বিষয়গুলো। আইন ও শৃংখলা, অর্থ, পূর্ত, রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়গুলো সংরক্ষিত বিষয় এবং শিক্ষা জনস্বাস্থ্য, কৃষি স্বায়ত্তশাসন, এগুলো হস্তান্তরিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬। এ আইনের মাধ্যমে ভারত সচিবের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। যে পরিমাণে প্রাদেশিক মন্ত্রিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। ঠিক সে পরিমাণে ভারত সচিবের ক্ষমতা খর্ব করা হয়।

৭। নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রবর্তন ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে বলা হয় যে, প্রদেশিক আইনে পরিষদে অন্তত শতকরা ৭০জন সদস্য নির্বাচিত হবেন এবং শতকার ২০ জনের বেশি সরকারি সদস্য থাকতে পারবে না। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন পরিষদে তিন প্রকার সদস্য থাকবেন। যেমন- নির্বাচিত সদস্য, সরকারি সদস্য এবং মনোনীত সদস্য।

৮। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। প্রথম বারের মতো সরকারি বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৯। এ আইনের অধীনে ইংল্যান্ডে "ভারতীয় হাইকমিশনার পদের" সৃষ্টি হয়। তিনি ইংল্যান্ডে ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করবেন। তাঁর কার্যকাল হবে পাচঁ বছর।

১০। এই আইন দশ বছর পরে একটি সংবিধিবদ্ধ কমিশন গঠনের প্রস্তাব করে। এ সময়ের মধ্যে যেসব শাসন সংক্রান্ত ও সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন করা হবে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করা ছিল এই কমিশনের মূখ্য উদ্দেশ্য।

১১। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা প্রর্বতন করা হয়।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কী ?

ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এক অভিনব শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে দ্বৈতশাসন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন তথা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন অনুসারে প্রদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। দ্বৈত শাসনের মূল কথা হলো সরকারের বিভিন্ন বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করে শাসন করা। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারের বিষয়গুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়–একভাগে সংরক্ষিত বিষয় এবং অপরভাগে হস্তান্তরিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এভাবে দুই অংশে ভাগ করা সরকারি বিষয়গুলো কিভাবে এবং কাকে দিয়ে শাসিত হবে তাও ১৯১৯ সালের আইনে ঠিক করে দেওয়া হয়। বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত বিষয়গুলো প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর শাসন পরিষদের সহায়তায় এবং পরামর্শ অনুযায়ী শাসন করতেন। এসব বিষয়ের মধ্যে ছিল পুলিশ, জেল, পানিসেচ, বিচার বিভাগ এবং অর্থ বিভাগ।

অপরদিকে হস্তান্তরিত বিষয়গুলো প্রাদেশিক গভর্নর মন্ত্রিদের পরামর্শক্রমে শাসন করতেন। এ সব বিষয়ের মধ্যে ছিল শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক শাসন ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে যে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তা বাস্তবে তেমন কোন সুফল বয়ে আনতে পারে নি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রদেশগুলোর শাসন ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক ভাবেই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।

মূলত সরকারের বিষয়গুলোর ছিল অবাস্তব বিভক্তি, দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা, গভর্নরের হাতে ক্ষমতার আধিক্য, কেন্দ্রীকরণ, মন্ত্রিদের দায়িত্বহীনতা, প্রদেশগুলোর ব্যয় মিটাবার মতো আর্থিক অসচ্ছলতা, সংসদীয় ঐতিহ্যের অভাব, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দলীয় রাজনীতির অনুপস্থিতি, জনগণের বিরোধিতা, ইত্যাদি কারণে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল।

সারকথা

ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক চাহিদা পূরণ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের চাপে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক আইন প্রবর্তন করেছেন। রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক আইনগুলোরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ সরকার এদেশে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য যে কয়টি আইন প্রবর্তন করেন, তারমধ্যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অন্যতম। এই আইনকে এদেশের স্বাধীনতা আইনের মাইলফলকও বলা যেতে পারে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম পদক্ষেপ ছিল প্রদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারের বিষয়গুলোকে দুভাগে ভাগ করে শাসন করা। ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দলই একে অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যকর বলে প্রত্যাখান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন।

১। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অপর নাম হচ্ছে -
ক) রেগুলেটিং অ্যাক্ট
খ) মর্লি-মিন্টো সংস্কার
গ) মন্টেগু- চেমসফোর্ড সংস্কার
ঘ) ভারত স্বাধীনতা আইন

২। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ কি চুক্তি করে ?
ক) লক্ষ্মৌ চুক্তি
খ) বেঙ্গল প্যাক্ট
গ) নেহেরু চুক্তি
ঘ) অসহযোগ চুক্তি

৩। দ্বৈত শাসন কী ?
ক) আইন পরিষদের নাম
খ) সংস্কারের নাম
গ) প্রদেশে সরকারের বিষয়গুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে শাসন করা
ঘ) কেন্দ্রের বিশেষ আইন

উত্তর : ১ - গ, ২ - ক, ৩ - গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পটভূমি উল্লেখ করুন।
২। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্বৈত শাসন কী ? ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে-এর কার্যকারিতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি—
- ◆ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।
- ◆ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকরিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কী ?

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। স্বায়ত্তশাসন বলতে বুঝায় 'স্বশাসন'। শব্দগত অর্থে তাই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে বুঝায় প্রদেশের নিজস্ব শাসন। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক। সংবিধানের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনার ক্ষমতাকেই তারা প্রাদশিক স্বায়ত্তশাসন বলে অভিহিত করেছেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারের সব ক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে সংবিধানিক নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার একে অপরের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত ও স্বাধীন থেকে নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবে। এটিই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণত প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং অর্থ এ তিনটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে–যেমন :

১। আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রদেশগুলো কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকবে এবং সেই সাথে প্রাদেশিক আইন সভা প্রাদেশিক সরকারেরও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে। অর্থাৎ সংবিধানে প্রদেশের জন্য যে বিষয়গুলো নিদিষ্ট করে দেওয়া হবে সেগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

২। প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। প্রাদেশিক আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইন সভার কাছে দায়ী থাকবে।

৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। জাতীয় সম্পদ ও রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে এমন নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যেন কোন প্রদেশকে আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল হতে না হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয়। প্রস্তাবিত এ যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই আইনে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্মতালিকায় ভাগ করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়গুলোর পরিচালনার ভার প্রাদেশিক সরকারের উপর অর্পিত হয়। একই সঙ্গে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে যে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয়। গভর্নর ও মন্ত্রিসভা গঠিত হয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদেরকে নিয়ে। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে আইনসভার নিকট দায়ী করা হয়। এভাবেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে তত্ত্বগতভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনই ছিল এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এন.সি.রায় এ সম্পর্কে বলেন যে, "প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রের (১৯৩৫) ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ।"

ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ভারতে স্বায়ওশাসন প্রদান করবে বলে ঘোষণা করে। ১৯১৭ সালে ঘোষণা করা হয় যে, যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ওশাসন প্রতিষ্ঠা করাই ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ ঘোষণার ফলসরূপ ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড আইনে হস্তান্তরিত বিষয়গুলোর উপর আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন প্রদেশগুলোতে পুনরায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করে। কিন্তু ভারতীয় জনগণ একে "সাদা কমিশন" নামে আখ্যায়িত করে বর্জন করে। পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে আবার প্রাদেশিক স্বায়ওশাসন প্রবর্তন করা হলেও ভারতীয় জনগণের প্রত্যাশিত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ সম্ভব হয় নি।

অবশ্য এ আইনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়। কাজেই বলা যায় ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের মধ্যদিয়ে মোটামুটি ভাবে এক ধরনের দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়।

যে নীতিগুলোকে সামনে রেখে ১৯৩৫ সনে ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ওশাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এটি মোটেই পূর্ণাঙ্গ ছিল না। আমরা পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে এই বক্তব্যটি যাচাই করবো।

১। প্রাদেশিক গভর্নর নিয়মতান্ত্রিক প্রধান ছিলেন না

সংসদীয় ও দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গভর্নর নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হন। প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারের হাতে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক গভর্নররা নিয়মতান্ত্রিক শাসক ছিলেন না। বরং তারাই ছিলেন প্রকৃত শাসক। তাদের ক্ষমতা ছিল অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত। যেমন, তাঁরা যে কোন সময় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতে পারতেন।

২। গভর্নরের নিয়োগ পদ্ধতি

গভর্নরগণ ছিলেন ব্রিটিশরাজ্যের প্রতিনিধি। তাঁরা ব্রিটিশ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন। এ ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি স্বায়ত্তশাসন নীতির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ছিল।

৩। গভর্নরের সীমাহীন ক্ষমতা

প্রাদেশিক গভর্নরের হাতে যে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা প্রাদেশিক স্বায়ওশাসনের মৌলিক ধারণার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ছিল। যেমন :

ক. আইন সভার উপর নিয়ন্ত্রণ

প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে আইন পরিষদের নিম্নকক্ষ ভেঙে দিতে পারতেন। আইন সভা প্রণীত বিল গভর্নরের সম্মতির জন্য প্রেরিত হলে তিনি এতে ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন এবং প্রাদেশিক আইন সভায় ইচ্ছার বিরূদ্ধে গভর্নরের আইন ও অধ্যাদেশ জারি করতে পারতেন।

খ. আইন সভার আর্থিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ

প্রাদেশিক সরকারের আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে গভর্নরগণ আইনসভার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারতেন। প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক বাতিলকৃত কোন ব্যয় বরাদ্দ পুনঃবহাল করার ক্ষমতা গভর্নরদেরকে প্রদান করা হয়েছিল।

গ. মন্ত্রিদের উপর গভর্নরের নিয়ন্ত্রণ

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি অনুযায়ী মন্ত্রিসভার হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গভর্নর মন্ত্রিদের সাথে পরার্মশ না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বিশেষ দায়িত্ব পালনের অজুহাতে গভর্নর মন্ত্রিসভার যে কোন পরার্মশ উপেক্ষা করতে পারতেন। এমনকি গভর্নর মন্ত্রিসভাকে ভেঙেও দিতে পারতেন।

৪। প্রদেশিক আইন সভার সীমাবদ্ধতা

প্রাদেশিক আইনসভা সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারতো না। যেমন ব্রিটিশ জনগণের বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতি হুমকি বা বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে এধরনের কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন পরিষদকে দেওয়া হয় নি।

৫। যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশের উপর অর্পণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর প্রাদেশিক সরকারের কোন ক্ষমতা ছিল না বললেই চলে। কারণ যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ে মতোবিরোধ দেখা দিলে সব সময় কেন্দ্রের অভিমতই বলবৎ থাকতো।

৬। প্রাদেশিক বিষয়ে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ

ব্রিটিশ সরকার নির্দেশ নামা জারির মাধ্যমে ভারতবর্ষের যে কোন প্রাদেশিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

৭। প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের সীমিত ক্ষমতা

প্রাদেশিক প্রশাসনে নিযুক্ত আই.সি.এস. ও আই.পি.এস. প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ ভারত সচিব কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। এ সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ গভর্নর জেনারেল, গভর্নর ও সচিবের মাধ্যমে পরিচালিত হতেন বলে তারা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ও আদেশ নির্দেশের প্রতি ইচ্ছাকৃত ভাবে উদাসীন ও অবহেলা দেখাতেন।

৮। গভর্নরের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিভাগ

বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং প্রদেশের আইন শৃংখলা রক্ষার বিষয়ে মন্ত্রিসভার পরিবর্তে গভর্নরের একক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রাদেশিক স্বায়ওশাসনের মূলনীতিই বিনষ্ট হয়েছিল।

৯। গভর্নর জেনারেলের অপ্রতিহত ক্ষমতা

গভর্নর জেনারেলের ব্যাপক ক্ষমতা স্বায়ওশাসনের মৌলিক নীতিকে খর্ব করেছিল। যেমন:-

ক. গভর্নর জেনারেল কর্তৃক গভর্নরদের উপর নিয়ন্ত্রণ

যেসব ক্ষেত্রে গভর্নরগণ 'স্বীয় বিচারবুদ্ধি বলে' বিশেষ দায়িত্ব পালন করতেন সে সব ক্ষেত্রে গভর্নরগণ সরাসরি গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে কাজ করতে বাধ্য ছিলেন।

খ. গভর্নর জেনারেল কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণা

গভর্নর জেনারেল জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে কেন্দ্রীয় আইন সভা প্রাদেশিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টির অজুহাতে গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আইনসভা ভেঙে দিয়ে প্রদেশের শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারতেন।

গ) গভর্নর জেনারেলের উপদেশাবলী

গভর্নর তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে উপদেশ পেতেন। এসব উপদেশাবলিকে গভর্নরগণ আদেশের মতোই মান্য করতেন।

সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসন শুধু তত্ত্বেই ছিল বাস্তবে ছিল না। ভারত সচিব, গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদের সীমাহীন ক্ষমতার কারণে এ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 'আড়ম্বরপূর্ণ প্রহসনে' পরিণত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কেবলমাত্র প্রাদেশিক অংশটুকুকে কার্যকর করা হয় ১৯৩৭ সালে। এ আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সর্বভারতীয় দুটো রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

নির্বাচনে যে এগারোটি প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাতে কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মুসলীম লীগ চারটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু একক ভাবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কংগ্রের মন্ত্রীরা একে একে পদত্যাগ করে। অবসান ঘটে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা।

সারকথা

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এ আইনের মাধ্যমে প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের কথা ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেও এই ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ কাজ। ফলে ১৯৩৫ সালের আইন বাস্তব প্রয়োগে ব্রিটিশ সরকার ব্যর্থ হয়। অবশ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর রাজনৈতিক দাবি , জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং ক্রমবর্ধমান অধিকার ও সচেতনতার চাপে বাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ক্রমাগতই উন্নততর ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৮৬১ , ১৮৯২ , ১৯০৯ , ১৯১৯ সলের ভারত আইন অপেক্ষা ১৯৩৫ সালের আইনের প্রকৃতি , বৈশিষ্ট্যই এর উদাহরণ।

তথাপি এর ত্রুটি , অবাস্তব কাঠামো , ক্ষমতা বণ্টন প্রভৃতি নীতিগুলোর কারণে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) দিন।

১। ১৯৩৫ সালের আইনের নাম কী ?

ক) রেগুলেটিং অ্যাক্ট

খ) ভারত শাসন আইন

গ) পিট অ্যাক্ট

ঘ) মর্লি-মিন্টো সংস্কার

২। প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসনে কোন তিনটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকে ?

ক) বিচার, যোগাযোগ, শিক্ষা

খ) প্রতিরক্ষা, পরিকল্পনা, পরিবহন

গ) দেশরক্ষা, তথ্য, শিক্ষা

ঘ) প্রতিরক্ষা, অর্থ, বৈদেশিক নীতি

৩। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ধারা অনুযায়ী প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কোন সালে ?

ক) ১৯৩৭

খ) ১৯৪০

গ) ১৯৩৬

ঘ) ১৯৪২

উত্তর ঃ ১ - খ, ২ - খ, গ - ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কী ? এর নীতিগুলো কী?

২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে কী জানেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।